দৈনিক ইনকিলাব

29 JUN 2008

পৃষ্ঠা কলাম

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সম্ভাবনাময় কার্যক্রম

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা

মাহমুদ জামাল

॥ এক ॥

বাংলাদেশে শিক্ষার অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। বর্তমানে এদেশের সাক্ষরতার হার প্রায় ৬৫%। অর্থাৎ এই হিসেব অনুযায়ী এখনও এদেশের ৩৫% লোক নিরক্ষর রয়ে গেছে। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচির প্রতি গুরুত্ব দেয়া অত্যন্ত জরুরী। কিভাবে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব তা নিয়ে নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা চলছে। আইন প্রণয়ন করে বা শিক্ষার প্রতি বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক কর্মসূচি চালু করে মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তারপরও দেশের শিক্ষার হার দ্রুত ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে না। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। তবে দারিদ্র্যতাই মূল কারণ বলে মনে করার পেছনে শক্ত যুক্তির অভাব রয়েছে। মূলতঃ জাতীয় অঙ্গিকার এবং শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগের অভাবই এর অন্যতম কারণ বলে অনুমিত হচ্ছে। তবে দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির প্রয়াস নেই তা নয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির প্রয়াসকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। এক. আশি ও নব্বইয়ের দশক এবং দুই. পরবর্তী দশক।দেশ স্বাধীনের অব্যবহিত পূর্বে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে। সে সময় দেশের সাক্ষরতার হার ছিলো ১৮.১%। স্বাধীনতার পর প্রথম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। তখন শিক্ষার হার গিয়ে দাঁড়ায় ২২.৮%-এ। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮১ সালে স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয় আদমশুমারীকালে শিক্ষার হার ৩৫.৮%-এ উন্নীত হয়। অর্থাৎ ৭৪ থেকে ৮১ সালের সাতটি বছরে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় ১৩% (৩৫.৮-২২.৮%) যা অভূতপূর্ব সাফল্য। শহীদ জিয়ার সাক্ষরতা আন্দোলন এই সাফল্য বয়ে আনে বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু '৯০ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ১৯৯১ সালে সাক্ষরতার হার ৩২.৪% ও ২০০১ সালে ৪৫.৩২%-এ পৌছায়। সর্বশেষ প্রাপ্ত সরকারী হিসেব অনুযায়ী ২০০৬ সালের সাক্ষরতার হার ৬৫% বলে অনুমান করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৯১ সাল থেকে যে ইতিবাচক পরিবর্তন দ্রুত ঘটেছে তার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো সমসাময়িক সময়ে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা আন্দোলন বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার ফলে জাতীয় পর্যায়েও পুনরায় শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। একই সাথে নব্বইয়ের শুরুতে তৎকালীন সরকার ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বেশ কয়েকটি শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হলো: ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন, একই বছর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'শিশু অধিকার' বিষয়ক সম্মেলন, ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'নয়টি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সম্মেলন ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলন-এর অন্যতম। এ সকল সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনগুলোতে গৃহীত অঙ্গিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি গৃহীত হয়। সম্মেলনগুলোর অঙ্গিকার বাস্তবায়নের জন্য তখন জাতীয়ভাবে চারটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। সেগুলো হল : ২০০০ সাল নাগাদ-

ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগে উন্নীতকরণ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৩০ ভাগে হ্রাসকরণ।

বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীতকরণ।

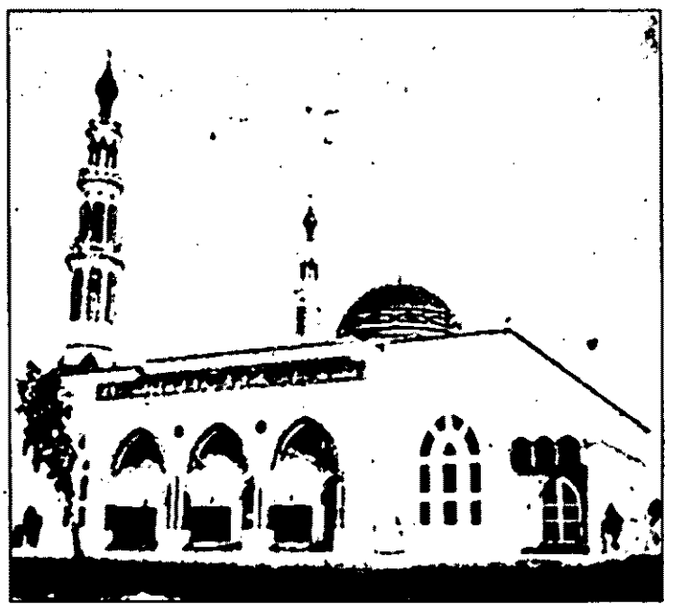

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৯৩ সালে তা দেশব্যাপী কার্যকর করা হয়। দেশের সকল মানুষের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌছে দেয়ার প্রত্যয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে ১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পরিচালনায় মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম প্রকল্প প্রভৃতি কর্মসূচি গৃহীত হয়।

দেশে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিটি প্রকল্পেরই কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। যে সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করেছে তা হলো ঃ

১. ৪-৫ বছরের শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ।

২. মসজিদভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা প্রদানপূর্বক শিক্ষাঙ্গন বহির্ভূত ৬-১০ বয়সস্তরের শিশুদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার পথ সুগমকরণ।

৩. বিদ্যালয়ত্যাগী বা বিদ্যালয়ে যায়নি ১১-১৪ বয়স্তরের এ ধরনের কিশোর-কিশোরীদের জন্য মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

৪. মসজিদভিত্তিক এ কর্মসূচির মাধ্যমে চলমান উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও কর্মসূচিটি সম্প্রসারণ পূর্বক ১৫-৩৫ বয়স্তরের নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ৫. নব্য ও স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় ক্রমিক ২ ও ৩-এর ৬-১০ ও ১১-১৪ বয়স্তরের কর্মসূচি বাদ দিয়ে লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়। এ পর্যায়ে স্থিরিকৃত প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়-

(ক) শিশুদের জন্য একটি সু-সংগঠিত মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা।

(খ) মসজিদভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা প্রদানপূর্বক শিক্ষাঙ্গন বহির্ভূত শিশুদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করা।

(গ) বিদ্যালয়ত্যাগী বা বিদ্যালয়ে যায়নি এইরূপ কিশোর-কিশোরীদের জন্য মসজিদভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) মসজিদভিত্তিক এই কর্মসূচির মাধ্যমে চলমান উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালীকরণ ও কর্মসূচিটি সম্প্রসারণপূর্বক বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষাচর্চা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা যাতে নবঅর্জিত সাক্ষরতা সতেজ ও সজীব থাকে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।